## সমাজ ও অর্থনীতি

অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যোগাযোগ যে অবিচ্ছেদ্য তা সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। মানব সৃষ্টির প্রারম্ভিক সূচনাকাল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজের উত্থান সম্পর্কিত ইতিহাস অর্থনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিকনিষ্ঠ। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ তাঁর *বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা* গ্রন্থে বলেছেন, "সমস্ত সম্পদের উৎস হলো শ্রম—অর্থতত্ত্ববিদগণ এ কথাই বলেন। যে প্রকৃতির কাছ থেকে অর্জিত উপাদনকে শ্রম রূপান্তরিত করে সম্পদে, সেই প্রকৃতির পরই শ্রমের স্থান। ... সমস্ত মানবিক জীবনের প্রাথমিক মূলগত শর্ত হলো শ্রম এবং তা এত ব্যাপ্ত যে একদিক থেকে বলতেই হয় যে, স্বয়ং মানুষই হলো শ্রমেরই সৃষ্টি"। এই শ্রম কখনও জৈবিক প্রয়োজন মেটায়, কখনও মানসিক বাসনা তৃপ্ত করে, কখনও সামাজিক এবং কখনও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। আদিম সামাজিক অবস্থা থেকে আধুনিক সমাজের উত্তরণ মূলত শ্রম বিভাজনেরই এক ইতিবাচক রূপ। এই শ্রম বিভাজন যেমন সমাজের রূপান্তর ঘটিয়েছে তেমনই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন সাধন করেছে। এঙ্গেলসের মতে, "উৎপাদন এবং বিনিময়ের সঙ্গে জড়িত মানসিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ-প্রত্যাশিত সামাজিক ফলাফল নিয়েই বুর্জোয়াদের সমাজবিজ্ঞান অর্থাৎ চিরায়ত অর্থশাস্ত্র মাথা ঘামায়। এই শাস্ত্র যে সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত অভিব্যক্তি তার সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ খাপ খায়। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসাবে গ্রহণ করে তারা। ব্যক্তি শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা ক্রীত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে না ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটিল সে সম্পর্কে তাহার ভাবনা নাই।" মার্কস্ কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির ওপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা আবশ্যক। অর্থনীতির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা মার্কসের কথাতেই প্রমাণিত হয়: "যন্ত্রবিদ্যা উদ্‌ঘাটিত করেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক, তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি এবং তা থেকে উদ্ভূত মানসিক ধ্যান-ধারণা।" *অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ এমন কতগুলো সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে—উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, যা বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগী"।

"এই সব উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এই বাস্তব বনিয়াদের ওপরই খাড়া হয় আইনবিষয়ক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং এরই উপযোগী হয়ে দেখা দেয় সামাজিক চৈতন্যের নির্দিষ্ট রূপগুলো।" মার্কসের এই উক্তি থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় অর্থনৈতিক গড়ন ("বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি") সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে কী ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকে। এই সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিই হলো অর্থনীতি এবং সামাজিক চৈতন্য ও জীবনধারার বিজ্ঞানই হলো সমাজতত্ত্ব।

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে অর্থনীতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। অর্থনীতির পরিবর্তন যেমন সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে তেমনই সামাজিক পরিবর্তনও মূলত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই সম্ভবপর হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা পল্লী-নগর সম্পর্কিত বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তা হলে দেখা যাবে, অর্থনৈতিক গড়নের পরিবর্তন কেমন ভাবে পল্লীসমাজকে নগরসমাজে রূপান্তরিত করেছে। আবার যদি আমার কৃষি-অর্থনীতি ও শিল্প-অর্থনীতি সম্পর্কিত রূপান্তরতত্ত্ব আলোচনা করি সেখানেও দেখা যাবে সামাজিক গড়নের পরিবর্তন কেমন করে কৃষি-অর্থনীতিকে শিল্প-অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করেছে। পশুপালন, অরণ্য সংরক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে যে অর্থনৈতিক

Copyrighted material

বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল তার সঙ্গে নগরায়ণের এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে ('নগরায়ণ' হলো সমাজতাত্ত্বিক একটি ধারণা)। নগরায়ণের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যে এক যোগাযোগ বর্তমান তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাকালের প্রাচ্য নগর কৃষ্টির প্রগতির মধ্যে। যখনই সমাজের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল তখনই শ্রমবিভাজন পদ্ধতির প্রবর্তন হলো এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অর্থনীতিরও ঘটতে শুরু করল বিলোপ। হাউজারের ভাষায়, "এই সময়ে জটিল শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করল যা ক্রমে উদ্বৃত্তের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করল।" পুরাকালের সমাজে অর্থনৈতিক যে ধারণাগুলোর প্রচলন ছিল সেগুলি যথাক্রমে 'কর্ম, 'সম্পদ' অর্থনৈতিক ক্ষমতা', 'বিলাসব্যসন', 'দারিদ্র্য', 'গোষ্ঠীবদ্ধ দাসত্ব', 'কৃষির রাষ্ট্রায়ত্ত পদ্ধতি', 'ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কিত অধিকার' ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে সে সময়ে যে 'স্বার্থপরতা' বোঝাত তা শুধু ভরণপোষণের উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট ছিল না — বেশি মূলধনের প্রতিও ঝোঁক ছিল যথেষ্ট বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র শ্রমবিভাজনকে বৈজ্ঞানিক করে তুলতেই সাহায্য করেনি বরঞ্চ, অর্থনৈতিক সম্পর্ককে 'পদ' থেকে 'চুক্তির' পথে নিয়ে গেছে। কুটিরশিল্পের বিকাশ এবং কারিগরি বৃত্তির আধিপত্য প্রাক্-শিল্পসভ্যতার বিশিষ্ট এক উপাদান যা তদানীন্তন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ('গিল্ড পদ্ধতি') প্রবর্তন করেছিল। এই ধরনের অর্থনৈতিক গড়ন নগরের প্রাকৃতিক গড়নকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সুষ্ঠু শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ, আদানপ্রদান পদ্ধতিকে করে তুলেছিল সক্রিয়। অর্থঋণ, অর্থের আদানপ্রদান এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হলো সুষ্ঠু শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণেরই ফসল যা ক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হলো শিল্পায়ন। জোবার্গ এই অর্থনৈতিক উপাদানের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজের কথা আলোচনা করেছেন:

(ক) প্রাক্-শিল্পনির্ভর সমাজ;

(খ) শিল্পায়নশীল সমাজ; এবং

(গ) সম্পূর্ণ শিল্পনির্ভর সমাজ।

প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সাথে সাথে সমাজেরও যেমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে অর্থনৈতিক গড়নেরও ঘটে রূপান্তর। শিল্পনির্ভর সমাজের উন্মেষের সাথে সাথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে — প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার হয় — উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পেশার বিশিষ্টতা এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করে যা প্রতিযোগিতা এবং আর্থিক নীতির পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। হাউজারের মতে, "জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আকৃতি, ঘনত্ব এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভঙ্গুর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা বিভিন্ন সমস্যা যেমন শ্রমশক্তি ক্ষয়, সম্পদের বৈষম্যনীতি, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অব্যবস্থা, বেকারত্বের সমস্যা, একচেটিয়া নীতির চর্চা, উৎপাদনে ভেজাল এবং আনুষঙ্গিক প্রতারণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী ইত্যাদির সৃষ্টি করে।" এর ফলে নগরাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। সরকার কর্তৃক অবশেষে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক আইন এবং প্রথা প্রবর্তিত হয় — আয়ের সমবণ্টনের প্রতি নজর দেওয়া হয় (আয়কর), শ্রমিক সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প চালু করা হয়।

নগরসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় অর্থনীতি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে কী ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। প্রথম নগরসভ্যতা কালে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০–৫০০ খ্রিস্টাব্দ) উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যই ছিল পল্লীসমাজ হতে নগরসমাজে রূপান্তরিত হবার মূল হাতিয়ার। বণিকগোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা ও তৎপরতার ফলে কিছু শিল্প যথা বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, অলংকারশিল্প, আসবাবপত্র, পূর্তশিল্প ইত্যাদির বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। সেই সময়কালের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক নগরসভ্যতার কিছু উপকরণ যথা, সেচপদ্ধতি, সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সামরিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করেছে। বাণিজ্য ছিল তখন মূল অর্থনৈতিক মাধ্যম। সুমেরুবাসীগণ গম, বার্লি ইত্যাদি বিক্রয় করত, ইজিপ্টবাসীগণ উত্তর আফ্রিকা এবং নিকটপ্রাচ্য দেশগুলোর সঙ্গে

Copyrighted material

বাণিজ্য করত। ক্রিটান মিনোয়ানের নগরগুলি ডুমুর, বার্লি এবং অলিভ তেল নিয়ে বাণিজ্য করে বেড়াত—আথেন্স এবং করিন্থ ইতালিতে বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এর প্রতিফলন পড়ল সামাজিক গড়নের ওপর। যখন জনসংখ্যার বিচলনীয়তা, যুদ্ধবিগ্রহ এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা কমতে শুরু করল তখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেখা দিল এক বিরাট শূন্যতা। সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণার হলো পরিবর্তন। মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারিত হলো।

দ্বিতীয় নগরসভ্যতা কালে (১০০০–১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) এক নতুন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চেনার উন্মেষ ঘটে। ভ্রাম্যমাণ বণিকগোষ্ঠী এই সময়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে তৎপর হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক বিকাশ এই সময়ে মূলত বাণিজ্যের ওপরই ছিল নির্ভরশীল। এ ছাড়া আর যে তিনটি অর্থনৈতিক উপাদান উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল তা হলো:

(ক) কৃষিপ্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস এবং জমিকে উর্বর করে তোলার সার্বিক প্রচেষ্টা;

(খ) উৎপাদন ভিত্তিক বাণিজ্য যা মূলত কুটিরশিল্পের সূচনা করেছিল; এবং

(গ) 'বিনিময় অর্থনীতির' রূপান্তর এবং 'মুদ্রা অর্থনীতির' উদ্ভব।

এই অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সামাজিক প্রক্রিয়ার বিশেষ কিছু দিক। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব, নগর আইন প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিবেশতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং শিল্পকলার স্তর বিন্যাস ইত্যাদি সামাজিক ঘটনাগুলো অর্থনীতির রূপান্তরেরই ফসল। যতদিন পর্যন্ত বণিকগোষ্ঠী বিদেশী হিসাবে পরিচিত ছিল এবং স্বভাবতই আইনসিদ্ধ ছিল না ততদিন তাদের 'সামন্ততান্ত্রিক' ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। ক্রমে ক্রমে এই বণিকগোষ্ঠী তদানীন্তন সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক রক্ষাকবচ দাবি করল। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বণিকগোষ্ঠী সমাজে এক সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং অর্থনীতির জগতে এক উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করে। এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী অতঃপর আইন প্রণয়ন করতে প্রয়াসী হয়। বণিকগোষ্ঠীর চাপে পড়ে তদানীন্তন নগরগুলো সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হলো। এতে নগরবাসীগণ সমাজে এক আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অনুশাসনের কঠোর বন্দীদশা হতে মুক্ত হয়। বণিকগোষ্ঠী অবাধ বাণিজ্য করবার স্বাধীনতা দাবি করে। ক্রমে ক্রমে এই বণিকগোষ্ঠী জমি এবং সম্পত্তির অধিকার ভোগ করা এবং বাণিজ্যিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নগর আদালতের প্রবর্তন করবার আইন প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হলো। উদ্ভব হলো আইনসিদ্ধ আঞ্চলিক পুলিশি ব্যবস্থা—প্রবর্তন হলো আয়কর, বাণিজ্যকর ইত্যাদির। অর্থনৈতিক রূপান্তরের ঢেউ এসে কৃষ্টির দুনিয়াতেও আঘাত করে। এই সময়ের শেষদিকে শিল্পচর্চা অভিজাত শ্রেণীর মানুষের হাতে এসে পৌঁছায়। তাদের সৃজনশীলতা তখন গণসংস্কৃতির খোলস ত্যাগ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সৃষ্ট হতে থাকে।

অবশেষে যন্ত্রশিল্পে পৃথকীকরণ ও সম্প্রসারণ, বিভিন্ন মূলধন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা, নগর-স্বদেশ অক্ষরেখা এবং পরিবেশজনিত গড়নের জটিলতা, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থার এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

পল্লীসমাজ থেকে নগরসমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রেও অর্থনীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, যা বিশেষ সামাজিক অবস্থার বার্তাবহ। একথা সত্য যে নগরসভ্যতার সামাজিক গড়ন এবং সেই সম্পর্কিত উপাদানগুলোর জন্ম পল্লী সমাজের গর্ভ থেকে। অর্থনীতিই হলো এই রূপান্তরের প্রধান কারণ। গ্রামাঞ্চলের কৃষি এবং পশুপালন সম্পর্কিত অর্থনীতি শহরাঞ্চলের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না—সময়, নৈপুণ্য এবং পরিশ্রমকে অন্য কাজে নিয়োজিত করবার নিমিত্তে সাহায্যও করে। ফলে শিল্পায়নের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই শিল্পায়নের নেপথ্যে আবার আছে গ্রামীণ কুটিরশিল্প এবং কারিগরি দক্ষতার অবদান।

এই অর্থনীতির রূপান্তর সমাজ বিবর্তন এবং সামাজিক উন্নয়নকে কী ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা আলোচনা করা যাক।

Copyrighted material



## সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতির ভূমিকা

### আদিম সমাজ

এঙ্গেলসের মতে, 'শ্রম'ই হলো সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি এবং এই শ্রম এক অর্থনৈতিক উপাদান। "প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং কেবল মাত্র নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য-সাধনে লাগায়, প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে। এটাই হলো মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত ও মূলগত পার্থক্য। আর পুনরপি শ্রমই ঘটিয়েছে এই পার্থক্য"।

লেনিনের মতে, "বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সব রকমের ব্যবহারমূল্য, এমনকী একেবারে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় ব্যবহারমূল্যগুলিকে পর্যন্ত পরস্পর সমীকরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে, সামাজিক সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যে সব বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিল কী? এদের সাধারণ মিল এখানে যে এরা সকলেই শ্রমের ফল। ... পণ্য উৎপাদন হলো সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করেছে। (সামাজিক শ্রম বিভাগ)। ... কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্তি হলো এক ও অভিন্ন মনুষ্য শ্রমশক্তি"। পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগের যে সামাজিক

অর্থনৈতিক পরিবর্তনীয় উপাদান যথা উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনীয় উপাদানের সংযুক্তিই হলো অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু। স্মেলসারের মতে, অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব হলো উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং দ্রব্য ও কার্যকারিতার সাথে সমাজতত্ত্বের এক পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়। অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব প্রথমত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিফলিত করে। কী করে এই সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সামাজিক ভূমিকা এবং গোষ্ঠীবদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাই হলো অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকের আলোচ্য বিষয়। যে অর্থনীতি 'শ্রমবিভাজন' সম্পর্কিত তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের সাদৃশ্য অনেক বেশি। অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ কোন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং ভূমিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মনিষ্ঠ হয়, কী ধরনের নীতি এবং বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কেমন করে সমাজতাত্ত্বিক উপাদান এই অর্থনৈতিক উপাদনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে সে সম্পর্কেই তত্ত্ব রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজতাত্ত্বিক উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যা অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিদৃশ্য হয় সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ স্মেলসার বলেন যে, অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকের কর্তব্য হলো বৃত্তিগত ভূমিকার সঙ্গে পারিবারিক ভূমিকা এক করে ভাবা এবং এর রাজনৈতিক গঠন কী করে নিয়ন্ত্রিত হয় তা আলোচনা করা। তাঁর মতে, এই পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক এই উভয় ক্ষেত্রকেই সংযুক্ত করে এবং বিভিন্ন ভাবে

Copyrighted material



ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। স্মেলসার অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের কার্য দুই ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

(ক) অর্থনৈতিক এককের (economic unit) মধ্যে; এবং

(খ) অর্থনৈতিক একক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে।

প্রথম ক্ষেত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ধরা যায় তা হলে বলা যায় যে অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ শুধুমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক, বিচ্যুতি, চক্রান্ত এবং সংঘর্ষই পর্যালোচনা করেন না—এই সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কও অনুধাবন করেন। এই ধরনের তত্ত্ব সাধারণত শিল্প সমাজতত্ত্বেই আলোচিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ অর্থনৈতিক একক এবং অপারপর এককের (আইননিষ্ঠ, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ধর্মীয়) মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবন করেন। এই ধরনের তত্ত্ব অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিস্তৃত ক্ষেত্রকেই (জননীতি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, অর্থনৈতিক শ্রেণীসম্পর্ক ইত্যাদি) প্রতিফলিত করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ অর্থনৈতিক জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ 'অর্থ' সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও নিজেদের নিয়োজিত করেন।

সমাজতত্ত্বের এমন কিছু উপ-বিষয় আছে যা মূলত অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বৃত্তির সমাজতত্ত্ব (sociology of occupation), কার্যের সমাজতত্ত্ব (sociology of work), জটিল সংস্থার সমাজতত্ত্ব (sociology of complex organization) এবং শিল্প সমাজতত্ত্বের (industrial sociology) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বৃত্তির সমাজতত্ত্ব সাধারণত পেশা কিংবা বৃত্তির প্রকৃতি, কার্য এবং অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃত্তির ভূমিকা সম্পর্কিত তত্ত্ব নিয়েই গঠিত। কার্যের সমাজতত্ত্বও বৃত্তির সমাজতত্ত্বের অনুরূপ। তবে কার্যের সমাজতত্ত্ব মূলত কার্যের কারণ, প্রকৃতি এবং দর্শনের তত্ত্বকেই প্রতিফলিত করে। জীবনের সঙ্গে কার্যের যোগাযোগ কতখানি এবং কার্যের মাপকাঠিতে জীবনধারণের মান, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব পর্যবেক্ষণ, বেকারত্ব এবং আধা বেকারত্বের কারণ ও দারিদ্রের সীমা নির্ধারণ করাই হচ্ছে এই বিষয়ের মূল বিষয়বস্তু।

জটিল সংস্থার সমাজতত্ত্বে মূলত সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন, প্রকারভেদ, লক্ষ্যমাত্রার প্রকৃতি ও বিচ্যুতি, অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক (সামাজিক, মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক) উপাদান বিশিষ্ট সংস্থা, আমলাতন্ত্র, কর্তৃক ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে।

শিল্প সমাজতত্ত্ব মূলত কার্য, পেশা বাণিজ্যিক সংস্থায় মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা প্রকৃতি, শিল্পসংস্থার সামাজিক গঠন ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, মজুরিপ্রথা, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প সংকট ও সমস্যা ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক বিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে গঠিত।

স্মেলসারের ভাষায়, "Even though economic sociology and economics deal with the same complex of activities, there is little formal overlap between them because each field operates with different classes of dependent variables, independent variable and explanatory models."। স্মেলসারের মতে, এটা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা নয়। অর্থনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনীয় উপাদানের মধ্যে এক ফলিত সম্পর্ক আছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি বেতন নিয়ে কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয় তবে তা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে রাজনৈতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। ভেতরে শ্রমিকগণের অসন্তোষ দানা বাঁধতেও যেমন সাহায্য করে তেমনই প্রশাসনকেও বিপদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। এটা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করবার পক্ষে যেমন যথেষ্ট তেমনই উত্তেজনা সৃষ্টির রসদও জোগাতে পারে। এই ধরনের অসন্তোষ এবং শ্রমিক সংগঠন ক্রমে রাজনৈতিক কার্যকলাপে পরিণত হয় এবং প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করে।

Copyrighted material